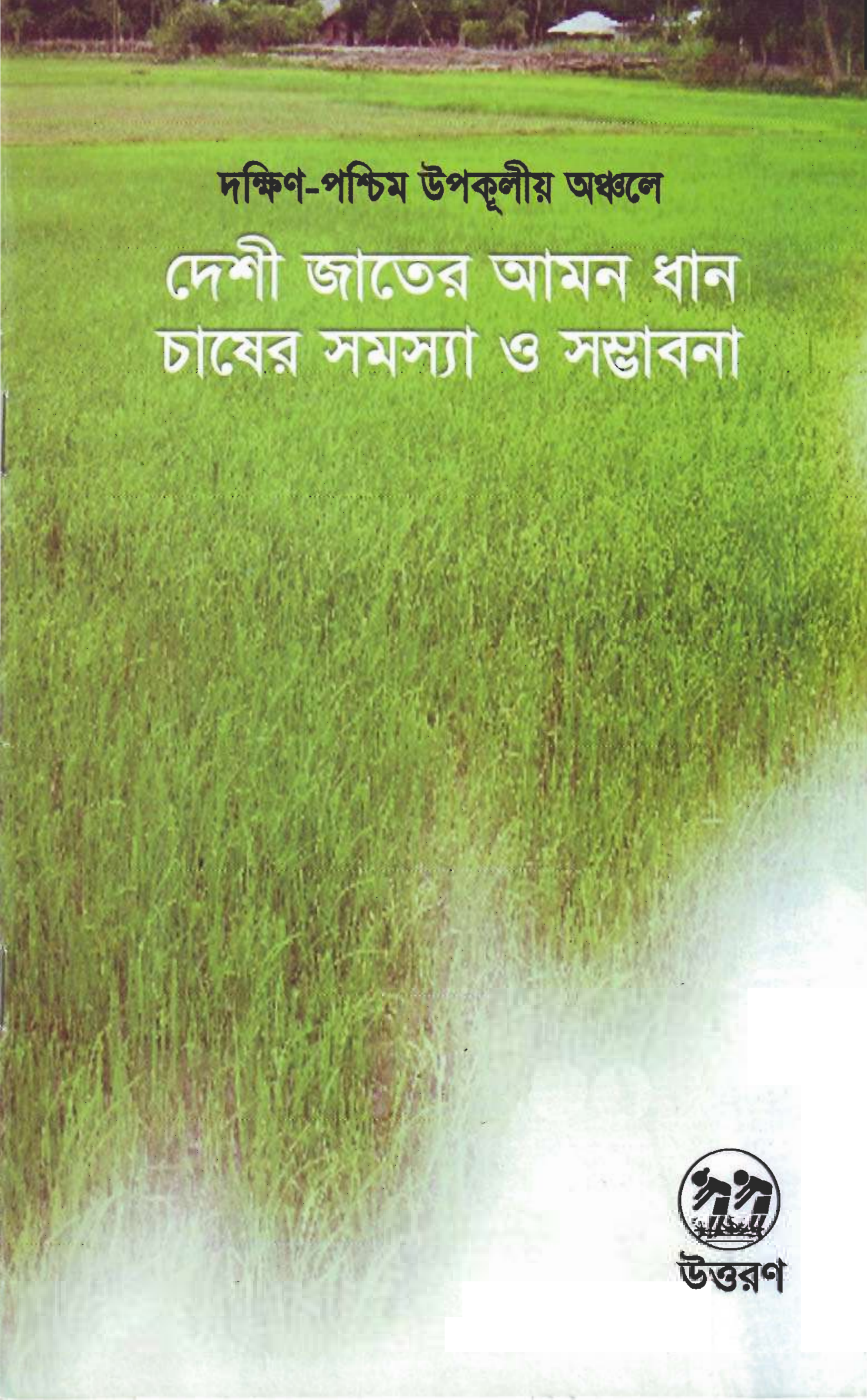

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে

দেশী জাতের আমন ধান চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা

উত্তরণ

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে

দেশী জাতের আমন ধান চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা

নির্দেশনায়

শহিদুল ইসলাম

সম্পাদনায়

সুধাংশু কুমার সরকার

ওবায়দুল হক পলাশ

মোঃ বদিউজ্জামান

কৃতজ্ঞতায়

সরদার আবু ইউসুপ

আলী আহম্মেদ আকুঞ্জী

আঃ বারী সরদার

উত্তরণ

নির্দেশনায় :
শহিদুল ইসলাম

সম্পাদনায় :
সুধাংশু কুমার সরকার
ওবায়দুল হক পলাশ
মোঃ বদিউজ্জামান

প্রকাশনা :
রিসার্স এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল
উত্তরণ
জুন ২০০৯

যোগাযোগ :
উত্তরণ
৪২, সাত মসজিদ রোড (চতুর্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা -১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৯১২২৩০২
ই-মেইল : uttaran@bdonline.com
Website : http://www.uttaran.org

প্রচ্ছদ : শেখর কুমার বিশ্বাস
অংকুর, খুলনা

ডিজাইন :
এস. আকাশ–অংকুর, ৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ০৪১-৮১৩৮৬০

মুদ্রণে : প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ০৪১-৮১০৫৯৭

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। সমগ্র দেশের একটি বড় অংশ উপকূলীয় অংশে সংযুক্ত। এমনিতে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। প্রতি বছর বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিধ্বস, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, জলাবদ্ধতা, টর্নেডোসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ আক্রান্ত হয়। এর ফলে একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় অন্যদিকে দারিদ্রতার প্রকট গ্রাসে মানুষের জীবন হয়ে পড়ে দূর্বিসহ।

স্বাধীনতার পর থেকে এপর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে যা ক্ষতি হয়েছে তা মোট জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ। সুতরাং এহেন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করা একদিকে যেমন সহজসাধ্য বিষয় নয়, তেমনি-বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে বিশাল জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যাপ্ত সেবা প্রদান করা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার পক্ষে কষ্টকর। উত্তরণ মানুষের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের মানবিক ক্ষমতার বিকাশ সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ অতিরিক্ত ফসল ফলানোর জন্য হাইব্রিড সহ উচ্চফলনশীল ধান চাষে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু এদেশের কৃষকদের বংশ পরম্পরায় স্বজ্ঞানের মাধ্যমে জমিতে দেশী জাতের বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ করার অভিজ্ঞতা আছে। এ সকল ধানের মধ্যে- পঙ্খিরাজ, জলকুমারী, মধুমালা, জলকাদা, খেজুরঝুপি, তুলসিমালা, জামাইপাগল, হরিশংকর, মাছরাঙ্গা, গঙ্গাজল, কটকতারা, ব্যাত, কালজিরা, কালবরুই, ঢ্যাপো, বালাম, মনোহর প্রভৃতি হরেকরকম দেশী জাতের ধান খরা, বন্যা, শীত, লবনসহ নানা বিরুপ প্রাকৃতিক পরিবেশে সহ্য করার ক্ষমতা এ সব ধানের ছিল।

দেশের উপকূলীয় এলাকা, বন্যা কবলীত ও হাওড় এলাকায় নিয়মিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে মিজোরিওর-জার্মানী কাজ করে যাচ্ছে। উত্তরণ মিজোরিওর-জার্মানীর সহযোগিতায় সাতক্ষীরা অঞ্চলে দেশী জাতের ধান চাষ ও সম্প্রসারনের জন্য কৃষকদের সংগঠিত করে আসছে। কৃষকদের ব্যাপক সাড়া পাওয়ার পর কৃষক সংগঠন তৈরী করে তাদের প্রশিক্ষন ও ধান চাষের জন্য এ ধরনের একটি বুকলেট তৈরীর উদ্যোগ গ্রহন করে।

আমার বিশ্বাস এ ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক ভাইয়েরা তাদের হারিয়ে যাওয়া ধান আবার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন এবং তাদের আর বীজ ধানের জন্য ঠকতে হবে না। মিজোরিওর-জার্মানী এর প্রতি উত্তরণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কারন তাদের সহযোগির্তার জন্যই এ অঞ্চলে দেশী জাতের ধান চাষের প্রেরনা যোগাচ্ছে।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
জুন ২০০৯

পটভূমি

পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর খরস্রোতা পললভূমি দিয়ে গঠিত ***বাংলাদেশ*** পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এসব নদীর অববাহিকা দিয়ে ধীরে ধীরে জনবসতী গড়ে ওঠে। বেঁচে থাকার জন্য তাই মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে খাদ্য। বাংলাদেশে কৃষিকাজের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন অন্যতম নিয়ামক হয়ে উঠল। কৃষির মধ্যে ধান বাংলাদেশের সবথেকে বেশী উৎপাদিত ফসল। এ দেশের কৃষকরা যুগ যুগ ধরে নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মিশ্রন ঘটিয়ে ধান চাষ করে পরিবারের সকল চাহিদা মেটাতো।

বাংলাদেশে অতি প্রাচীন কাল হতে ধান চাষের শুরু হয়েছে। প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে আর্যরা তাদের জীবিকার সন্ধানে সুদূর ককেশাস অঞ্চল হতে এদেশে আসে। আর্যদের মধ্যে “আলপিনো” নামক একটি গোষ্টি সিন্ধু নদের অববাহিকা হয়ে উর্বর পলল ভূমির খোঁজে সেই সময়ে এ অঞ্চলে বসবাসরত আদি বাসিন্দা দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশে গিয়ে কৃষিকাজের জন্য পরস্পর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মিশ্রন ঘটিয়ে কৃষিকাজ শুরু করে। শুরু হয় ধান উৎপাদন। কারন এ অঞ্চলের ভূমি ছিল নদীবাহিত পলল দিয়ে গঠিত উর্বর মাটি। এ মাটিতে বীজ ছিটালেই অতি সহজে ধান জন্মাতে পারে। সেই বহু যুগ পূর্ব হতে এ অঞ্চলে প্রতিটি বাড়ীতে দেখা যেত গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু ও পুকুর ভরা মাছ। সেই সময় হতে চাষীরা বিনা খরচে দেশী জাতের বিভিন্ন প্রকার ধান চাষ করতো এবং প্রচুর পরিমানে বছরশেষে গোলাভরে ধান রাখতো। প্রায় ১০,০০০ দেশী জাতের ধান এ অঞ্চলের কৃষকরা চাষ করতো। এ সকল ধানের মধ্যে- পঙ্খিরাজ, জলকুমারী, মধুমালা, জলকাদা, খেজুরঝুপি, তুলসিমালা, জামাইপাগল, হরিশঙ্ক, মাছরাঙ্গা, গঙ্গাজল, কটকতারা, ব্যাত, কালজিরা, কালবরুই, ঢ্যাপো, বালাম, মনোহর প্রভৃতি হরেকরকম দেশী জাতের ধান খরা বন্যা শীত লবন সহ নানা বিরুপ প্রাকৃতিক পরিবেশে সহ্য করার ক্ষমতা এ সব ধানের আছে। বহু কাল হতে এ সব জাতের ধান মানুষের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে আবহমান কালের সংস্কৃতির অংগ হয়ে এ দেশের কৃষকের মনে আলোকিত হয়ে আছে। ধান কাটার সময়ে মানুষ উৎসব করে ধান ঘরে তুলতো এবং সযত্নে ধান বীজ সংরক্ষন করতো। তাছাড়া সময় ও ঘটনা ভেদে তারা পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এ সব ধানের চাল থেকে হরেকরকম উপাদেয় খাদ্য তৈরী করতো। যেমন পার্বনের সময় কোন ধানের চাল লাগবে বা বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন আসলে কোন ধানের চাল দিয়ে পোলাও, বিরিয়ানি বা পিঠা পায়েস তৈরী হবে সেটা বলাবাহুল্য। গ্রামের এই প্রবাহমান উৎসব মুখর পরিবেশ আমাদের লোকজ সংস্কৃতির অংশ হয়ে-মানুষ বংশ পরস্পরায় মনের মধ্যে লালন করে আসছে।

কিন্তু বাস্তবতা আজ অতি কষ্টের ও বেদনার - আমাদের এই অঞ্চলের সেই প্রিয় চির চেনা দেশী জাতের আউশ ও আমন ধান হারিয়ে যেতে বসেছে। হাজার হাজার বছর ধরে বাপ দাদাদের রেখে যাওয়া সম্পদ আজকে প্রায় ধ্বংসের পথে। বিলুপ্তি হয়ে গেছে হাজার হাজার জাতের দেশী জাতের ধান। এই প্রজন্মের চাষীরা জানেই না যে আমাদের এই দেশে পূর্বপুরুষরা এই মাটিতেই প্রায় ১০,০০০ এর উপর দেশী জাতের ধান চাষ করতো। এখনও পর্যন্ত যে কয়টি জাত অবহেলায় অবশিষ্ট আছে সকলে মিলে সচেষ্ট হলে সেগুলো রক্ষা করা যাবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সাধারণতঃ ৩টি মৌসুমে ধান উৎপাদন হয়ে থাকে-আউশ, আমন এবং বোরো। তাছাড়া এই এলাকার ফসলী জমি সমূহকে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমমত: মিষ্টি পানি নির্ভরশীল এলাকা দ্বিতীয়ত: ঈষৎ লবন পানি নির্ভরশীল এলাকা। এ দুটো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এলাকা সমূহের ফসল উৎপাদনের কৌশল, ধানের প্রজাতি ও সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন।

মিষ্টি পানি নির্ভরশীল এলাকায়

মিষ্টি পানি নির্ভরশীল এলাকায় তিন মৌসুমে যথা আউশ, আমন ও বোরো ধান উৎপাদন হয়ে থাকে। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতের প্রচলন ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে বোরো মৌসুমে প্রচুর ধান উৎপাদন হয়। তাছাড়া আমন মৌসুমেও ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আউশ মৌসুমে ধানের উৎপাদন অনেক কমে গেছে এবং গভীর বিল এলাকায় যেখানে আগে ধান চাষ হতো সেখানেও ধানের উৎপাদন কমে গেছে। অধিকন্তু উপকূলীয় জলাভূমি এলাকায় ধানের উৎপাদন মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস পেয়েছে। কারণ

আমন মৌসুম:

ইতোপূর্বে দেশীয় প্রজাতির আমন ধান ছিল যা সাধারণত: ৭/৮ ফুট বা ৮/৯ ফুট পানির মধ্যে জন্মাতে পারতো এবং কৃষকেরা এসকল ধানের চাষ করতো। এসব ধান সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ মাসে কৃষকেরা বুনতো এবং পৌষ মাসে কৃষকেরা ফসল ঘরে তুলতো। তাই এসব প্রজাতির ধান উৎপাদন করতে সাধারণত ৮/১০ মাস সময় লাগে। কিন্তু বোরো মৌসুমে ব্যাপক উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের প্রেক্ষিতে আমন মৌসুমে দেশীয় প্রজাতির ধানের উৎপাদন কমে গেছ। কারণ পৌষ-মাঘ মাসে কৃষকেরা এসকল নীচু জলাভূমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে এবং বৈশাখ মাসে ফসল কেটে থাকে। তাই বোনা আমন ধান চাষ করা কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে বছরে সাধারণত কৃষকেরা ১টি ফসলই পায় এবং আমন মৌসুমে এসকল নীচু জলাভূমিতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

ঈষৎ লবণ-পানি নির্ভলশীল এলাকা

ঈষৎ লবণ-পানি সহনশীল এলাকায় ষাটের দশকে সরকার উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করে মিষ্টি পানি এলাকায় রূপান্তর করার প্রচেষ্টা চালায় যা বর্তমানে ব্যাপক পরিবেশ

বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁধের ফলে জীব-বৈচিত্রের ছন্দ-পতন ঘটেছে, দেশী প্রজাতির অনেক প্রকার ধানের বিলুপ্তি ঘটেছে, জোয়ার-ভাঁটা প্লাবন ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হওয়ার ফলে জোয়ার-ভাঁটার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং এরফলে প্লাবন ভূমিতে পলি অবক্ষেপিত না হতে পেরে মৃত প্রায় নদীসমূহে পলি অবক্ষেপিত হয়েই নদীগুলোকে ভরাট করে ফেলেছে, যা সৃষ্টি করছে ব্যাপক জলাবদ্ধতা। তাছাড়া যে বাঁধ লবণাক্ততা দূর করার জন্যে নির্মাণ করা হয়েছিল সেই বাঁধের অভ্যন্তরে শুষ্ক মৌসুমে বৈশ্বিক প্রক্রিয়ায় চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণ হওয়ার প্রেক্ষিতে লবণাক্ততার পরিমাণ মোটেও কমেনি বরং বৃদ্ধি পেছে। তাই ঈষৎ লবণ-পানি নির্ভরশীল উপকূলীয় জলাভূমিতে বাঁধের মাধ্যমে মিষ্টি পানি নির্ভরশীল উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতের প্রচলন যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি দেশী প্রজাতির ঈষৎ লবণ-পানি সহনশীল অনেক ধানের বিলুপ্তি ঘটেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন তো বাড়েনি বারং তা যথেষ্ট পরিমাণ কমে গেছে। উল্লেখ্য উপকূলীয় জলাভূমিতে আমন ধানেরই চাষ হয়ে থকে। যদিও বাঁধ নির্মাণের পরপরই কিছু এলাকাতে উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন ধান বা আউশ ধানের প্রচলনের চেষ্টা হয়েছিল তবে তা কার্যকর হয়নি।

বর্তমানে দেশী আমন ধানের অবস্থাঃ

পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বাংলার কৃষক সমাজ আজ এক মহা সন্ধিক্ষনের মধ্যে অবস্থান করছে। অতিরিক্ত ফলন পাওয়ার আশায় কৃষকরা নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পাশ কাটিয়ে বিদেশী বেনিয়াদের চাপিয়ে দেয়া ধারনা থেকে আলোড়িত হয়ে অতি উৎসাহে জমিতে এখন উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ শুরু করেছে। তাই এখন আর দেখা যায় না চৈত্র মাসের শেষে প্রথম বৃষ্টিতে এবং বৈশাখ মাসের শুরুতে সারি সারি কৃষকের কাধেঁ লাঙ্গল-জোয়াল, মাথায় ধান বীজের ধামা-খুচি, আইলে বসে কৃষকদের আজ হুকোতে তামুক টানার মধ্য দিয়ে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা ভাগকরে নেওয়ার দৃশ্য আজ শুধু স্মৃতি। গ্রাম বাংলা থেকে বেশ আগে থেকেই এসব হারিয়ে গেছে । এখন আর জমিতে চাষ শেষ হওয়ার সংগে এক সাথে হৈ হৈ রবে বীজ ধান ছিটানোর কোন আওয়াজ কারো কানে পৌছায় না। উচ্চফলনশীল (HYV) জাতের ধান চাষের জন্য এখন কৃষকরা ব্যবহার করছে পাওয়ার টিলার, ট্রাকটর,শ্যালোমেশিন, ধানঝাড়ার মেশিনসহ আরও অনেক যান্ত্রিক উপকরন যা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।

বিলের নীচু অংশ যেখানে ৭/৮ ফুট পানি থাকত সেখানে দেশী জাতের আমন ধান খুব ভাল হতো এবং আমাদের এই এলাকার বিলে হরিশঙ্ক, মাছরাঙ্গা, গঙ্গাজল প্রভৃতি দেশী জাতের ধান খুব ভাল হতো। কিন্তু বর্তমানে আমাদের

এই সকল বিলের নিচু অংশের জমিতে চিংড়ী চাষ, সাদা মাছ চাষ হওয়ার ফলে আমন ধানের জমি অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। আর জমির উচু অংশে উচ্চফলনশীল (HYV) রোপা আমন এবং বিভিন্ন প্রকার হাইব্রিড জাতের ধান চাষ হচ্ছে। আর্ন্তজাতিক ধান গবেষনা ইনিস্টিটিউট (IRRI) ও বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনিস্টিটিউট (BRRI) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল (HYV) আমন ধান বাংলাদেশের এ সব জমি দখল করে নিয়েছে। উচ্চফলনশীল (HYV) জাতের মধ্যে BR-11, BR-10, BR-30, BR-31, BR-32, BR-33, BR-34, BR-37, BR-38, BR-39, BR-40, BR-41, BR-44, BR-46, বিনাধান-৪, বিনাশাইল, সোনার বাংলা-১, সোনার বাংলা-৬ (হাইব্রিড) প্রভৃতি ধানের চাষ করতে কৃষকরা এখন অভ্যস্ত। এই ধানের বীজ বি.এ.ডি.সি এর মাধ্যমে গুনাগুন পরিক্ষিত হওয়ার পর চাষ করার জন্য বাজারজাত করা হয়। এ সকল ধান চাষের জন্য সঠিক ভাবে চাষ পদ্ধতি অনুসরন করতে হয়। এছাড়া অনুমোদিত কিছু দেশী ও বিদেশী বীজ কোম্পানি যেমন Cynzenta, Ciba-Gaigy, Global Agrovate, ACI দের বীজ চাষীরা বেশী ফলনের লোভে চাষ করে যাচ্ছে। চাষী ও শংশ্লিষ্ট কৃষি সেক্টর এর অভিজ্ঞ পরামর্শক এবং ঐ সকল কোম্পানির মতে-

- উচ্চফলনশীল ধান বিশেষ করে হাইব্রিড জাতের ধান ১ শতকে ১ মন ধান উৎপাদিত হয়।
- উচ্চফলনশীল এ সকল ধানের ফলন বেশী হওয়ায় অধিক লাভ হয়।
- সল্প সময়ে মধ্যে ফসল ঘরে উঠানো সম্ভব।
- বেশী ফলন হওয়ার কারনে দেশের খাদ্য চাহিদা অনেকাংশে কমে যাবে।
- অধিক ফলন হওয়ার কারনে দারিদ্র্য বিমোচন সহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

উচ্চফলনশীল জাতের পাশাপাশি বাংলাদেশে ১৯৯৮ সাল হতে কৃষকরা হাইব্রিড জাতের বীজ ধানের সংগে পরিচিত হতে শুরু করল। দেশী ও বিদেশী কিছু কোম্পানি হাইব্রিড বীজ ধান তখন বিদেশ থেকে আমদানী করা শুরু করল । এর মধ্যে সোনারবাংলা-১, সোনারবাংলা-৬,(রোপা আমন) আলোক, লোকনাত, অমর, আলোড়ণ(বোর) প্রভৃতি জাতের হাইব্রিড ধান কৃষকরা ব্যাপকভাবে চাষ করা শুরু করল। ২০০৮ সালে ৩৫০০ মে.টন হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি করা হয়। ব্রাক, ACI, আফতাব, সুপ্রিম সিড, লাল তীর প্রভৃতি কোম্পানি এ ধরনের বীজ বাজারজাত করে থাকে। এ সকল কোম্পানির দাবি এ জাতের ধান চাষ করে বাংলাদেশে ৮-১০ লক্ষ মে.ট পর্যন্ত ধানের ফলন বৃদ্ধি ঘটেছে *(প্রথম আলো ১৮/০৫/০৮)*।

উচ্চফলনশীল ধান চাষের উৎপাদন খরচঃ

১ বিঘা জমিতে BR-11 বা এ ধরনের উচ্চফলনশীল জাতের আমন ধান রোপন করতে যে পরিমান মূলধন ও সময় এর প্রয়োজন সেটা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৮ কেজি	২৫	২০০
৩	বীজতলাতে চারা পরিচর্যা			১০০
৪	এক বিঘা জমি চাষ	৩ বার	২০০	৬০০
৫	ঘাস বাছাই	৩ জন	১০০	৩০০
৬	চারা উঠানো ও রোপন জন(শ্রমিক) খরচ	৫ জন	১০০	৫০০
৭	জমিতে প্রয়োজনীয় পানি সেচ			৫০০
৮	সার ও কীটনাশক প্রয়োগ			১১০০
৯	আগাছা নিড়ানী	৩ জন	১০০	৩০০
১০	ধান কাটা ও বিছালী বাধা	৭ জন	১০০	৭০০
১১	ধান ঝাড়া (মেশিনে)	২ জন	১০০	২০০
	মোট			৪৭০০/-

ফলন ঃ ১ বিঘাতে ১৪/১৬ মন।

আয় ঃ ১৬ মন ধানের বাজার মূল্য ৮০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নীট লাভ ঃ ৪০০০/-টাকা।

কেন এ অবস্থা সৃষ্টি হলো ঃ

বাংলাদেশে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত দেশের ৯৫ শতাংশ জমিতে দেশী জাতের ধান চাষ হতো। কিন্তু এর পর থেকে কৃষকরা বেশী ফলনের আশায় বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির লোভনীয় ও আকর্ষনীয় প্রচারের দিকে ঝুকে পড়লো। এবং শুরু হলো কৃষি নিয়ে নতুন খেলা। আর এ খেলায় নির্মম শিকার হলো এদেশের সহজ সরল কৃষকরা আর লাভবান হলো বহুজাতিক কোম্পানির এজেন্টরা। কারন চাষীরা আজ জমিতে চাষ দেয়ার আগে উচ্চফলনশীল (HYV) জাতের ভাল বীজ খোঁজার জন্য পাগল হয়ে যায়। অথচ একসময়ে আমাদের চাষীদের ঘরে বীজের ভান্ডার ছিল। আমাদের মায়েরা ধান থেকে বীজ বের করে যত্ন করে সংরক্ষন করতেন। তখন প্রত্যেকের ঘরে বীজ ধান মজুত থাকতো। বহুজাতিক কোম্পানির এসব বীজ থেকে যে ধান উৎপন্ন হয়

পরবর্তীতে তা আর বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। আর করলেও তার ফলন ভয়ানক খারাপ হয়। তাছাড়া এ সব বীজ খুবই স্পর্শকাতর কারন সঠিক নিয়ম মেনে চাষ করতে হয় যা আমাদের দেশের কৃষকরা সঠিকভাবে অনুসরন করতে পারে না। যেমন-পরিমানমত পানি সরবরাহ, পরিমানমত রাসায়নিক সার প্রয়োগ এবং কীটনাশক প্রয়োগের সমন্বয় সাধন যা আমাদের কৃষকরা করতে সক্ষম হয় না। ফলে ফলনও আশানুরুপ হয় না। বাংলাদেশে ৮০ দশক থেকে উচ্চফলনশীল(HYV) জাতের ধান চাষ ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটেছে। এবং এ জন্য কৃষকরা বীজ ধানের জন্য ঐ সব কোম্পানির কাছে ধরনা দিতে বাধ্য হয় কারন এখন কৃষকদের ঘরে নিজস্ব কোন বীজ ধান নেই। বীজ চলে গেছে বিদেশী বেনিয়াদের হাতে। তারা যে দামে বীজ ধানের মূল্য নির্ধারিন করবে আজ কৃষকদের সেই চড়া দামে বীজ ধান ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু তাই নয় উচ্চফলনশীল (HYV) এ বীজ ধান চাষের জন্য আনুসংগিক যে সব উপকরন লাগে তাও তাদের নিকট থেকে ক্রয় করতে হয়। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কৃষকদের আজ পুরোপুরি বিদেশী কোম্পানির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে এবং চাষের জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। তা সত্বেয় কৃষকরা অধিক ফলনের লোভে জমিতে বেশী মুলধন বিনিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে। উচ্চফলনশীল জাতের ব্যাপক প্রসারনের কারনে বর্তমানে দেশের মাত্র ৫ শতাংশ পরিমান জমিতে দেশী জাতের ধান চাষ হচ্ছে।

দেশী জাতের আমন ধান চাষের সম্ভাবনা ঃ

উচ্চফলনশীল (HYV) জাতের ধান চাষের প্রথম দিকে কৃষকরা সুফল পেলেও ধীরে ধীরে এ সকল ধানের ফলন কমতে শুরু করলো কারন-

- এই জাত তৈরী হয় দুটি ভিন্ন ভিন্ন গুনসম্পন্ন জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে।
- দীর্ঘদিন ধরে এই সংকরায়ন প্রক্রিয়া চলতে থাকে যা কমপক্ষে ৬-৭ বার পর্যন্ত হয়।
- উচ্চফলনশীল জাতগুলো এমনভাবে তৈরী যা অধিক সার গ্রহন করে দ্রুত বাড়তে পারে।
- কিন্তু বাস্তবে এই সংকরায়নের ফলে যে গুনাগুন সম্পন্ন নতুন জাতটিতে তৈরী হয় তা দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায় না।
- তাই প্রথম পর্যায়ে বেশী ফলন হলেও পরবর্তীতে এর ফলন কমতে শুরু করে।
- ধান থেকে বীজ রাখলে ফলন কমে যায়।

ব্রি-র মহাপরিচালক ড.মো.নূর-ই-এলাহী বলেন-উচ্চফলনশীল (HYV) জাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ফলন প্রতিবছর কমে যায়। এ কারনে তিন বছর পর পর বি.এ.ডি.সি থেকে নতুন বীজ কিনে তা জমিতে রোপন করার পরামর্শ দেন *(প্রথম আলো ১৭/০৫/০৮)*।

উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড ধান চাষে একদিকে কৃষকরা যেমন বীজ কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে অন্যদিকে মাটি ও পরিবেশের উপর এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এসব জাতের ধান চাষের জন্য প্রচুর পরিমানে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করতে হয় এবং এর জন্য কৃষকদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাছাড়া ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা অতিরিক্ত অর্থ যোগাড় করতে সক্ষম হয় না। এমনকি অনেকসময় এই অর্থ যোগানোর জন্য এই সব ক্ষুদ্র চাষীরা মহাজনের কাছ থেকে চাষের সময় দাদনে আগাম অর্থ ঋন গ্রহন করে। অনেক সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে চাষীরা তাদের কাঙ্খিত ফসল ঘরে তুলতে পারে না। মহাজনের দাদনের টাকা পরিশোধের চাপে চাষীরা তাদের ক্ষুদ্র জমিটুকু মহাজনের নিকট বন্দক দিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড ধান চাষের ফলে-

- বীজ ধানের জন্য কৃষকরা বীজ কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।
- জমি চাষ ও পরিচর্যার জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেড়ে গেছে।
- ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহারের কারনে পানিতে আর্সেনিক ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- জৈব সারের পরিবর্তে রাসায়নিক সারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বেড়ে গেছে।
- অধিক পরিমানে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
- প্রতি বছর দেশে প্রায় ৮০০০ মে.টন কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে।
- কৃষি জমিতে এত ব্যাপক পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জলজ জীব-বৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখিন।
- এনড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ডিডিটি, রিপকর্ড, সিমবুশ ইত্যাদি জাতীয় কীটনাশক মাছের জন্য চরম বিষাক্ত।
- এ সকল কীটনাশক নীচু এলাকার ধান ক্ষেতে প্রয়োগের সাথে সাথে ওই স্থানসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থানরত মাছের সাথে সাথেই মাছ মারা যায়।

কিন্তু দেশী জাতের আমন ধানের ফলন তুলনামূলকভাবে একটু কম হলেও এটা পরিবেশের সংগে মানানসই এমনকি প্রতিকূল পরিবেশেও দেশী জাতের আমন ধান বেড়ে উঠতে পারে তাছাড়া এ ধানের জন্য জমিতে তেমন সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করা লাগে না।

বাংলাদেশের কৃষকরা বহু কাল পূর্ব হতে পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেশী জাতের ধান চাষ সফল ভাবে করে এসেছে। দেশী জাতের ধান চাষের জন্য বলতে গেলে অতিরিক্ত কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না। বীজ ধানের জন্য তাকে কোম্পানির নিকট ধরনা দিতে হয় না। কারন চাষীরা উৎপাদিত ধান থেকে নিজেরাই বীজ ধান বাছাই করতে পারে। বাড়ীতে মহিলারা নিজেরা বীজ সংরক্ষন করতে পারে। আমাদের এ অঞ্চলের জমিতে দেশী আমন জাতের যে সকল ধান ভাল হয় তন্মধ্যে ***হরিশঙ্ক, মাছরাঙ্গা, গঙ্গাজল*** অন্যতম। এ সব জাতের ধান এ অঞ্চলের মাটি ও পরিবেশের সংগে বহু যুগ আগে থেকে খাপখাইয়ে আসছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে ভাবে ধানের বীজ সংরক্ষন করতেন ঠিক সেভাবেই বংশপরম্পরায় কৃষকরা এখনও ধানের বীজ সংরক্ষন, চারা তৈরী, জমি প্রস্তুত , পরিচর্যা, ধান কাটা থেকে মলা পর্যন্ত কৃষকরা দেশী জাতের আমন ধান চাষ করে ভাল ফল পাচ্ছে। এ সকল দেশী জাতের আমন ধান যা হাজার বছর ধরে কৃষকরা আমাদের এই এলাকার বিলে চাষ করে যাচ্ছে। এ জাতের ধান তিন ভাবে চাষ করা যায় -

জাতের নাম ঃ হরিশঙ্ক

রং ঃ খোসা খয়েরী লাল, আকৃতি-পেট মোটা এবং চাল সাদা।

গন্ধঃ স্বাভাবিক

জমির ধরন ঃ নীচু জমি যেখানে ৭/৮ মাস পর্যন্ত পানি থাকে এবং পানির উচ্চতা ৫/৭ ফুট পর্যন্ত এ ধান হতে পারে এবং মধ্যম ও একটু উচু জমিতেও হরিশংক ধান নিম্নক্তো পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতিঃ

ক) বোনা (ছিটানো)
খ) গাছড়া
গ) পাতা

ক) বোনা (ছিটানোর) মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

- চৈত্র মাসের জো বৃষ্টিতে ১ এক বিঘা জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ২/৩ বার চাষ দিতে হবে।
- বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত চষা জমি ফেলে রাখতে হবে।
- বৈশাখ মাসের জো বৃষ্টিতে বীজ ধান (শুকনো) ঐ জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হবে।

- বীজ ধান ছিটানোর পর ঐ জমি দোয়াড় (দুই) চাষ দিতে হবে এবং ৩/৪ বার বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ১ (এক) দিন পর জমি আবার ৩/৪ বার ভাল করে বাসই (মই) দিতে হবে।
- ১০/১৫ দিন পর চারা গজানোর পর দেখতে হবে যদি ঘন পরিমানে চারা জন্মায় তাহলে কিছু পাতলা করে দিতে হবে।
- অনেক সময় এই চারা গাছড়া হিসেবে অন্য জমিতে রোপন করা যেতে পারে।

পরিচর্যাঃ

ধানের চারা গজানোর ১/২ মাসের মধ্যে ঝরা/আগাছা মেরে ফেলতে হবে। অনেক সময় পানিতে ভেসে আসা হাওজা (কচুরীপানা) আসলে পরিস্কার করে দিতে হয়।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

- জমির যে অংশের ধান ভাল সেই অংশ ৩/৪ দিন জমিতে ধান কাটার পর রাখতে হবে।
- ধান কাটার পর বীজ ধান রাখার জন্য আলাদা করে ধান বাছাই করতে হবে।
- বাছাইকৃত ধান পা দিয়ে ডলে ভাল করে ঝেড়ে রোদে শুকাতে হবে।
- ৫/৬ দিন রোদে দিতে হবে এবং ধানের ভিতর চাল শক্ত না হওয়া পর্যন্ত রোদে দিতে হবে।
- মরা বা চিটে ধান আলাদা করতে হবে।
- রোদে শুকোনর পর মুখ বেধে রাখতে হবে যাতে বাতাস বা পোকা না লাগতে পারে।
- কলশি/হাড়ি/প্লাষ্টিক/ড্রাম এর পাত্র মাচায় উপর রাখতে হবে।
- মাটির হাড়ি/মা-ঠের বাইরের অংশ আলকাতরার প্রলেপ দিতে হবে যাতে বাইরে থেকে জলীয়বাষ্প ভিতরে ঢুকতে না পারে।
- বাতাস ঢোকে না এ রকম পলিথিন যুক্ত বস্তার মধ্যে বীজ ধান রাখা যেতে পারে।

খরচ ঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	৪ বার	২০০	৮০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৫	আগাছা পরিস্কার	৫জন	১০০	৫০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
	মোট			১৭৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৯০০/-
নীট লাভঃ ৩১১০/-টাকা।
সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- নীচু জমি যেখানে ৭/৮ মাস পর্যন্ত পানি থাকে সেখানে অনায়াসে এই ধান জন্মাতে পারে।
- ৫/৭ ফুট পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

পল/খড়ের ব্যবহারঃ

- ➢ দেশী আমন ধানের পল/খড় গরু ভাল খায়।
- ➢ জ্বালানী হিসেবে পল/খড় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- ➢ নাড়া দিয়ে ঘর ছাওয়া যায়।
- ➢ নাড়া ওল, কচু ও পটলের জমিতে মাটির উপর বিছিয়ে দিলে ঘাস উঠতে পারে না।
- ➢ পল/খড় ও নাড়ার বাজার মূল্য প্রায় ৮০০/১০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

খ) গাছড়ার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন বেশী হয়ে থাকে।

জমির ধরনঃ মধ্যম শ্রেনীর জমি একেবার উচুও না নীচুও না (মধ্যম ঝড়াটে)।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতিঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে গাছড়া লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমান জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমান পানি দিয়ে জো তৈরী করে ৪ বার চাষ করতে হবে।
- চাষের শেষে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৫-৭ দিন পর ঐ ১ কাঠা জায়গায় (বীজতলা) ৫-৬ কেজি শুকনো বীজ ধান ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মাটির উপরিভাগ ২ বার চাষ দিয়ে বাসই (মই) দিয়ে সমান করে দিতে হবে।
- বীজ ধান বোনার ২ মাস পর অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত গাছড়া বড় হতে থাকবে।
- মাঝে মধ্যে গাছড়ার মধ্যে আগাছা জন্মালে পরিস্কার করা এবং ছাগল গরুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।
- আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে হাটু পর্যন্ত পানি বাধে এরকম ১ বিঘা জমিতে গাছড়া রোপন করার জন্য ২ বার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে ভাল করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- এরপর ঐ জমিতে বীজতলার গাছড়া তুলে রোপন করতে হবে।
- সারি থেকে সারি ১ ফুট দুরত্বে ১ গোছ গাছড়া লাগাতে হবে। গোছে ৩/৪ টি গাছড়া লাগাতে হবে।
- আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০ শে আষাঢ় পর্যন্ত জমিতে গাছড়া লাগানো যাবে।

পরিচর্যাঃ

গাছড়া রোপনের মাস খানেক পর যদি জমিতে আগাছা জন্মে তাহলে হাতবাছা দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ১০/১২ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

- পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ খরচ ঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	গাছড়া উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক)খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	আগাছা পরিস্কার	১ জন	১০০	১০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
	মোট			১৬৯০/-

আয়ঃ ১২ মন ধানের বাজার মূল্য ৬০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৯০০/-

নীট লাভঃ ৫২১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৪/৫ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

গ) পাতার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু পাতার মাধ্যমে চাষ করলে ফলন বেশী হয়ে থাকে।

জমির ধরন ঃ গাছড়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের জমি লাগে পাতার ক্ষেত্রে তার থেকে একটু উচু জমির দরকার।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতিঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে পাতা লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমান জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমান পানি দিয়ে জো তৈরী করে ২/৩ বার চাষ করতে হবে।
- জৈষ্ঠ্য মাসের বৃষ্টিতে বীজতলা ২ চাষ দিয়ে কাদামাটি করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৭-৮ কেজি ধান ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং এটা ঝুড়ি/চাঙ্গারী/ধামায় কলাপাতা উপর ধান ঢেলে রাখতে হবে। এরপর বস্তা দিয়ে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।

- ধানের কল রের হলে ১ কাঠা পরিমাণ বীজতলাতে বুনতে হবে।
- বীজ ধান ছিটানোর পর খেজুর পাতা দিয়ে ধানের উপর হালকা বাড়ি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। যাতে ঝড়/বৃষ্টির সময় এক জায়গায় জড়ো না হয়।
- যে সকল জমিতে পাতা লাগাতে হবে। সে সকল জমি ২ চাষ দিতে হবে এবং বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- পাতা তুলে ঐ চাষ করা ১ বিঘা জমিতে সারি থেকে সারি ১ ফুট অন্তর ১ গোছ লাগাতে হবে। গোছে ৩/৪টি করে পাতা রোপন করতে হবে।
- আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০শে আষাঢ় পর্যন্ত পাতা রোপন করা যাবে।

পরিচর্যাঃ

পাতা লাগানোর পর তেমন কোন পরিচর্যা নেই।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৮/১০ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	পাতা উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক)খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
	মোট			১৫৯০/-

আয়ঃ ১০ মন ধানের বাজার মূল্য ৫০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নীট লাভঃ ৪২১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৩/৪ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।

- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

জাতের নাম ঃ মাছরাঙ্গা

রং ঃ খোসা কালচে লাল, আকৃতি-মাঝারী মোটা এবং চাল সাদা।

গন্ধঃ স্বাভাবিক

জমির ধরনঃ মধ্যম জমি যেখানে পানির উচ্চতা ৫/৬ফুট পর্যন্ত হতে পারে ও একটু উচু জমিতে মাছরাঙ্গা ধান নিম্নক্তো পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতিঃ

ক) বোনা (ছিটানো)
খ) গাছড়া
গ) পাতা

ক) বোনা (ছিটানোর) মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

- চৈত্র মাসের জো বৃষ্টিতে ১ এক বিঘা জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ২/৩ বার চাষ দিতে হবে।
- বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত চষা জমি ফেলে রাখতে হবে।
- বৈশাখ মাসের জো বৃষ্টিতে বীজ ধান (শুকনো) ঐ জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হবে।
- বীজ ধান ছিটানোর পর ঐ জমি দোয়াড় (দুই) চাষ দিতে হবে এবং ৩/৪ বার বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ১ (এক) দিন পর জমি আবার ৩/৪ বার ভাল করে বাসই (মই) দিতে হবে।
- ১০/১৫ দিন পর চারা গজানোর পর দেখতে হবে যদি ঘন পরিমানে চারা জন্মায় তাহলে কিছু পাতলা করে দিতে হবে।
- অনেক সময় এই চারা গাছড়া হিসেবে অন্য জমিতে রোপন করা যেতে পারে।

পরিচর্যাঃ

ধানের চারা গজানোর ১/২ মাসের মধ্যে ঝরা/আগাছা মেরে ফেলতে হবে। অনেক সময় পানিতে ভেসে আসা হাওজা (কচুরীপানা) আসলে পরিস্কার করে দিতে হয়।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

- পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	৪ বার	২০০	৮০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৫	আগাছা পরিস্কার	৫জন	১০০	৫০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
	মোট			১৭৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নীট লাভঃ ৩০১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৫/৬ ফুট পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

খ) গাছড়ার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন বেশী হয়ে থাকে।

জমির ধরন ঃ মধ্যম শ্রেনীর জমি একেবার উচুও না নীচুও না (মধ্যম ঝড়াটে)।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতিঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে গাছড়া লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমান জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমান পানি দিয়ে জো তৈরী করে ৪ বার চাষ করতে হবে।
- চাষের শেষে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৫-৭ দিন পর ঐ ১ কাঠা জায়গায় (বীজতলা) ৫-৬ কেজি শুকনো বীজ ধান ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মাটির উপরিভাগ ২ বার চাষ দিয়ে বাসই (মই) দিয়ে সমান করে দিতে হবে।

- বীজ ধান বোনার ২ মাস পর অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত গাছড়া বড় হতে থাকবে।
- মাঝে মধ্যে গাছড়ার মধ্যে আগাছা জন্মালে পরিস্কার করা এবং ছাগল গরুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।
- আষাড় মাসের প্রথম দিকে হাটু পর্যন্ত পানি বাধে এরকম ১ বিঘা জমিতে গাছড়া রোপন করার জন্য ২ বার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে ভাল করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- এরপর ঐ জমিতে বীজতলার গাছড়া তুলে রোপন করতে হবে।
- সারি থেকে সারি ১ ফুট দুরত্বে ১ গোছ গাছড়া রাগাতে হবে। গোছে ৩/৪ টি গাছড়া লাগাতে হবে।
- আষাড় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০ শে আষাড় পর্যন্ত জমিতে গাছড়া লাগানো যাবে।

পরিচর্যাঃ

গাছড়া রোপনের মাস খানেক পর যদি জমিতে আগাছা জন্মে তাহলে হাতবাছা দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৮/৯ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	গাছড়া উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক)খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	আগাছা পরিস্কার	১ জন	১০০	১০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
	মোট			১৬৯০/-

আয়ঃ ৯ মন ধানের বাজার মূল্য ৪৫০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নীট লাভঃ ৩৬১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৫/৬ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

গ) পাতার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু পাতার মাধ্যমে চাষ করলে ফলন ভাল হয়ে থাকে।

জমির ধরনঃ গাছড়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের জমি লাগে পাতার ক্ষেত্রে তার থেকে একটু উচু জমির দরকার।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতি ঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে পাতা লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমান জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমান পানি দিয়ে জো তৈরী করে ২/৩ বার চাষ করতে হবে।
- জৈষ্ঠ্য মাসের বৃষ্টিতে বীজতলা ২ চাষ দিয়ে কাদামাটি করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৭-৮ কেজি ধান ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং এটা ঝুড়ি/চাঙ্গারী/ধামায় কলাপাতা উপর ধান ঢেলে রাখতে হবে। এরপর বস্তা দিয়ে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।
- ধানের কল রের হলে ১ কাঠা পরিমাণ বীজতলাতে হইা বুনতে হবে।
- বীজ ধান ছিটানোর পর খেজুর পাতা দিয়ে ধানের উপর হালকা বাড়ি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। যাতে ঝড়/বৃষ্টির সময় এক জায়গায় জড় না হয়।
- যে সকল জমিতে পাতা লাগাতে হবে। সে সকল জমি ২ চাষ দিতে হবে এবং বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- পাতা তুলে ঐ চাষ করা ১ বিঘা জমিতে সারি থেকে সারি ১ ফুট অন্তর ১ গোছ লাগাতে হবে। গোছে ৩/৪টি করে পাতা রোপন করতে হবে।

● আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০শে আষাঢ় পর্যন্ত পাতা রোপন করা যাবে।

পরিচর্যাঃ

পাতা লাগানোর পর তেমন কোন পরিচর্যা নেই।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

● পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	পাতা উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক)খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
	মোট			১৫৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নীট লাভঃ ৩২১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

● ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
● ৩/৪ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
● রোগ বালাই নেই।
● সার লাগে না।
● জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
● উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
● চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

জাতের নাম ঃ গঁঙ্গাজল

রংঃ খোসা ঘিয়ে, আকৃতি-মাঝারী মোটা এবং চাল সাদা।

গন্ধঃ স্বাভাবিক

জমির ধরনঃ মধ্যম জমি যেখানে পানির উচ্চতা ৫/৬ফুট পর্যন্ত হতে পারে ও একটু উচু জমিতে গঁঙ্গাজল ধান নিম্নক্তো পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতিঃ

ক) বোনা (ছিটানো)
খ) গাছড়া
গ) পাতা

ক) বোনা (ছিটানোর) মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

- চৈত্র মাসের জো বৃষ্টিতে ১ এক বিঘা জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ২/৩ বার চাষ দিতে হবে।
- বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত চষা জমি ফেলে রাখতে হবে।
- বৈশাখ মাসের জো বৃষ্টিতে বীজ ধান (শুকনো) ঐ জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হবে।
- বীজ ধান ছিটানোর পর ঐ জমি দোয়াড় (দুই) চাষ দিতে হবে এবং ৩/৪ বার বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ১ (এক) দিন পর জমি আবার ৩/৪ বার ভাল করে বাসই (মই) দিতে হবে।
- ১০/১৫ দিন পর চারা গজানোর পর দেখতে হবে যদি ঘন পরিমানে চারা জন্মায় তাহলে কিছু পাতলা করে দিতে হবে।
- অনেক সময় এই চারা গাছড়া হিসেবে অন্য জমিতে রোপন করা যেতে পারে।

পরিচর্যাঃ

ধানের চারা গজানোর ১/২ মাসের মধ্যে ঝরা/আগাছা মেরে ফেলতে হবে। অনেক সময় পানিতে ভেসে আসা হাওজা (কচুরীপানা) আসলে পরিস্কার করে দিতে হয়।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

- পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	৪ বার	২০০	৮০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৫	আগাছা পরিস্কার	৫জন	১০০	৫০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
	মোট			১৭৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নীট লাভঃ ৩০১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৫/৬ ফুট পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

খ) গাছড়ার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন বেশী হয়ে থাকে।

জমির ধরনঃ মধ্যম শ্রেনীর জমি একেবার উচুও না নীচুও না (মধ্যম ঝড়াটে)।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতিঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে গাছড়া লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমান জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমান পানি দিয়ে জো তৈরী করে ৪ বার চাষ করতে হবে।
- চাষের শেষে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৫-৭ দিন পর ঐ ১ কাঠা জায়গায় (বীজতলা) ৫-৬-কেজি শুকনো বীজ ধান ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মাটির উপরিভাগ ২ বার চাষ দিয়ে বাসই (মই) দিয়ে সমান করে দিতে হবে।
- বীজ ধান বোনার ২ মাস পর অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত গাছড়া বড় হতে থাকবে।
- মাঝে মধ্যে গাছড়ার মধ্যে আগাছা জন্মালে পরিস্কার করা এবং ছাগল গরুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

- আষাড় মাসের প্রথম দিকে হাটু পর্যন্ত পানি বাধে এরকম ১ বিঘা জমিতে গাছড়া রোপন করার জন্য ২ বার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে ভাল করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- এরপর ঐ জমিতে বীজতলার গাছড়া তুলে রোপন করতে হবে।
- সারি থেকে সারি ১ ফুট দুরত্বে ১ গোছ গাছড়া রাগাতে হবে। গোছে ৩/৪ টি গাছড়া লাগাতে হবে।
- আষাড় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০ শে আষাড় পর্যন্ত জমিতে গাছড়া লাগানো যাবে।

পরিচর্যাঃ

গাছড়া রোপনের মাস খানেক পর যদি জমিতে আগাছা জন্মে তাহলে হাতবাছা দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৮/৯ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	গাছড়া উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক)খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	আগাছা পরিস্কার	১ জন	১০০	১০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
	মোট			১৬৯০/-

আয়ঃ ৯ মন ধানের বাজার মূল্য ৪৫০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নীট লাভ ঃ ৩৬১০/-টাকা।

সুবিধা ঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৫/৬ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।

- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

গ) পাতার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু পাতার মাধ্যমে চাষ করলে ফলন ভাল হয়ে থাকে।

জমির ধরন ঃ গাছড়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের জমি লাগে পাতার ক্ষেত্রে তার থেকে একটু উচু জমির দরকার।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতিঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে পাতা লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমান জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমান পানি দিয়ে জো তৈরী করে ২/৩ বার চাষ করতে হবে।
- জৈষ্ঠ্য মাসের বৃষ্টিতে বীজতলা ২ চাষ দিয়ে কাদামাটি করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৭-৮ কেজি ধান ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং এটা ঝুড়ি/চাঙ্গারী/ধামায় কলাপাতা উপর ধান ঢেলে রাখতে হবে। এরপর বস্তা দিয়ে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।
- ধানের কল রের হলে ১ কাঠা পরিমাণ বীজতলাতে হইা বুনতে হবে।
- বীজ ধান ছিটানোর পর খেজুর পাতা দিয়ে ধানের উপর হালকা বাড়ি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। যাতে ঝড়/বৃষ্টির সময় এক জায়গায় জড় না হয়।
- যে সকল জমিতে পাতা লাগাতে হবে। সে সকল জমি ২ চাষ দিতে হবে এবং বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- পাতা তুলে ঐ চাষ করা ১ বিঘা জমিতে সারি থেকে সারি ১ ফুট অন্তর ১ গোছ লাগাতে হবে। গোছে ৩/৪টি করে পাতা রোপন করতে হবে।
- আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০শে আষাঢ় পর্যন্ত পাতা রোপন করা যাবে।

পরিচর্যাঃ

পাতা লাগানোর পর তেমন কোন পরিচর্যা নেই।

ধান কাটার সময় ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

- পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমান	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	পাতা উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক)খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
	মোট			১৫৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নীট লাভঃ ৩২১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৩/৪ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রচলন ও বাঁধ নির্মাণের প্রেক্ষিতে খাদ্য উৎপাদনের যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা কোন স্থায়ী সমস্যা নয়। তবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব এবং যদি তাৎক্ষনিকভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তাহলে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব। যেমন-

মিষ্টি পানি নির্ভরশীল:

মিষ্টি পানি নির্ভরশীল যে সকল নিচু জলাভূমি (গভীর বিল) আমন মৌসুমে অব্যবহৃত থাকে বা ফসল উৎপাদিত হয় না সেখানে দেশীয় প্রজাতি যথা- হরিশঙ্ক, মাছরাঙ্গা, ব্যাত, গঙ্গাজল প্রভৃতি জাতের ধানের প্রচলন ঘটানো সম্ভব। তবে যেহেতু এসকল জমিতে বোরো মৌসুমে কৃষকেরা উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে থাকে তাই কৃষকেরা বোনা আমন ধানের পরিবর্তে রোপা

আমন ধানের চাষ করতে পারে। মূলতঃ দেশী প্রজাতির আমন ধান আষাঢ়/শ্রাবণ মাসে রোপন করা হয়ে থাকে। সাধারণত এই সকল দেশী প্রজাতির ধানের উৎপাদন বিঘা প্রতি ১০-১৪ মণ। তাছাড়া এই সমস্ত নিচু জলা ভূমিতে চাষ উপযোগী কোন উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের প্রজাতির উদ্ভাবন ঘটেনি। সেহেতু দেশী প্রজাতির ধান লাগানোর বিকল্প নেই। সাধারণতঃ এসব ধান উৎপাদন খচর খুবই কম।

দেশী জাতের আমন ধান রক্ষার জন্য করনীয়ঃ

বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অনুসারে মিষ্টি পানি নির্ভরশীল যে সকল নীচু জলাভূমি সেখানে চিংড়ি চাষ বন্ধ করে দেশী আমন ধানের চাষ করা সম্ভব। উচ্চফলনশীল জাতের আমন ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের কারনে একদিকে যেমন জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে জলাভূমি থেকে দেশী প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে ফলে ব্যাপকভাবে মানুষের আমিষের চাহিদায় ঘাটতি হচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে জরুরীভাবে–

- গভীর জলাভূমিতে অনিয়ন্ত্রতভাবে চিংড়ি, সাদা মাছের চাষ কমিয়ে ফেলতে হবে।
- জোয়ারভাটা প্রবাহমান রাখার জন্য সকল খালের ইজারা বন্ধ করে খালগুলো উন্মুক্ত করতে হবে।
- জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবসার ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- স্থানীয় ভাবে উপযোগি দেশী জাতের বীজ ধান চাষ করতে হবে।
- নারীর বীজ সংরক্ষণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষি বাজেটের সকল ভর্তুকি/ন্যায্য হিস্যা আদায় করে নিতে হবে।
- দেশী জাতের আমন ধানের প্রসারের জন্য কৃষকদের চাষাবাদ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ কারার জন্য প্রর্দশনী প্লটের ব্যবস্থা করতে হবে।
- উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ বিস্তার সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে যদিও উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তবুও ঈষৎ লবণ-পানি নির্ভরশীল উপকূলীয় জলাভূমি, মিষ্টি পানি নির্ভরশীল নীচু জলাভূমি উপযোগী কোন উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আউশ মৌসুমে যদিও উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান উদ্ভাবিত হয়েছে কিন্তু তা কৃষকদের যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই যদি এসব অব্যবহৃত বা চিংড়ি চাষ এলাকার কয়েক লাখ একর জমিতে দেশীয় প্রজাতির ধানের প্রচলন ঘটানো যায়, তাহলে ব্যাপক খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করা সম্ভব ও কৃষি শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থান করা সম্ভব। তদুপরি দেশীয় প্রজাতির এসকল ধানের বীজ কৃষকেরা বাড়িতে নিজেরাই গুণগত মান বজায় রেখে সংরক্ষণ করতে পারে।

তালা ও তেতুলিয়া ইউনিয়নের নিচু জমি যেখানে বর্ষা মওসুমে বেশী পানি থাকে সে সকল জমিতে হরিশঙ্ক, মাছরাঙ্গা, গঙ্গাজল জাতের দেশী আমন ধান চাষ করে অধিক পরিমান লাভ করা যায়। মানুষের অবিবেচনা প্রসূত কর্মকান্ডের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে দেশী আমন ধান এবং যুক্ত হয়েছে চিংড়ী চাষের ঘের ও উচ্চফলনশীল জাতের আমন ধানের চাষ। তাই আমাদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে ব্যাপক প্রচারনা ও জরুরী পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে হাজার বছরের সেই দেশী আমন ধানের চাষ ফিরিয়ে এনে এ এলাকার কৃষকদের মুখে আবারও হাসি ফিরিয়ে আনতে হবে। উচ্চফলনশীল জাতের আমন ধান চাষের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে আমাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহি দেশীয় জাতের আমন ধান চাষ ও বীজ ধানের পূনরুদ্ধার করে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এই অঞ্চলের দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব।

উত্তরণ
৪২, সাত মসজিদ রোড (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন : +৮৮-০২-৯১২২৩০২
E-mail : uttaran@bdonline.com
website : http://uttaran.org